

কর্পোরেট আইন ও অনুশীলন

কোম্পানির সংজ্ঞা দাও:

কোম্পানি হলো একটি আইনি সত্তা, যা একাধিক ব্যক্তি বা শেয়ারহোল্ডারের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং আইনি পরিচয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। এটি নিজস্ব সম্পদ, ঋণ এবং দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম। কোম্পানি আইন অনুযায়ী গঠিত হয় এবং এটি একটি পৃথক সত্তা হিসেবে গণ্য হয়, যা শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে।

ন্যূনতম চাঁদা কী?

ন্যূনতম চাঁদা হলো সেই ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ যা একটি কোম্পানি প্রাথমিক শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে বাধ্য। এই পরিমাণটি কোম্পানির কাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহ করতে সাহায্য করে।

জাঙ্ক বন্ড কী?

জাঙ্ক বন্ড হলো একটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বন্ড, যা সাধারণত এমন কোম্পানির দ্বারা ইস্যু করা হয় যাদের ক্রেডিট রেটিং কম। যেহেতু এটি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, তাই এর সুদের হারও বেশি হয়ে থাকে। বিনিয়োগকারীরা বেশি আয় পাওয়ার আশায় এই ধরনের বন্ডে বিনিয়োগ করে, যদিও এর সঙ্গে মূলধন হারানোর সম্ভাবনাও বেশি।

বোনাস শেয়ার কী?

বোনাস শেয়ার হলো বিনামূল্যে প্রদত্ত শেয়ার, যা কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদেরকে তাদের অধিকার অনুযায়ী দেয়। এটি কোম্পানির মুনাফা বা সঞ্চিত তহবিল থেকে ইস্যু করা হয় এবং শেয়ারহোল্ডারদের কোনও অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয় না।

অন্দাবীকৃত লভ্যাংশ কী?

অন্দাবীকৃত লভ্যাংশ হলো সেই লভ্যাংশ যা কোনও আর্থিক বছরে ঘোষিত হলেও শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়নি। এটি কোম্পানির দায় হিসাবেও গণ্য হয় যতক্ষণ না শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ সম্পূর্ণ হয়।

কোরাম কী?

কোরাম হলো একটি বৈঠক বা সভা আয়োজনের জন্য ন্যূনতম সংখ্যক উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা। কোম্পানির মিটিং বৈধ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য বা শেয়ারহোল্ডারদের উপস্থিতি থাকা আবশ্যিক, সেটাকেই কোরাম বলে।

কার্যবিবরণী কাকে বলে?

কার্যবিবরণী হলো কোনও সভার আলোচনার সময় যা যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং আলোচনা করা হয়েছে তার লিখিত রেকর্ড। এটি অফিসিয়াল ডকুমেন্ট হিসাবে সংরক্ষণ করা হয় এবং ভবিষ্যতে রেফারেন্সের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বিবরণপত্র কী?

বিবরণপত্র হলো একটি নথি, যা কোনও কোম্পানি তার শেয়ার ইস্যু করার আগে প্রকাশ করে। এতে কোম্পানির তথ্য, ব্যবসার অবস্থা, আর্থিক বিবরণী, ঝুঁকি এবং শেয়ার ইস্যুর শর্তাবলী ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, যাতে বিনিয়োগকারীরা সচেতন হয়ে শেয়ারে বিনিয়োগ করতে পারে।

পরিচালকের যোগ্যতাসূচক শেয়ার কী?

পরিচালকের যোগ্যতাসূচক শেয়ার হলো কোম্পানির পরিচালকদের নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার যা তারা পরিচালকের পদ গ্রহণ করার জন্য অধিকারী হতে হবে। কোম্পানি আইন অনুযায়ী, নির্দিষ্ট পরিমাণ শেয়ার না থাকলে কেউ পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নিতে পারবেন না।

বন্টনযোগ্য মুনাফা কী?

বন্টনযোগ্য মুনাফা হলো সেই মুনাফা যা কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসাবে বন্টন করতে পারে। এটি সাধারণত সমস্ত ব্যয় এবং কর পরিশোধের পর বাকি থাকা মুনাফা থেকে আসে।

বিধিবদ্ধ সভা কী?

বিধিবদ্ধ সভা হলো নতুন কোম্পানি গঠিত হওয়ার পর প্রথম শেয়ারহোল্ডারদের বৈঠক। এই সভা সাধারণত কোম্পানি প্রতিষ্ঠার ৬ মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে কোম্পানির প্রথম কাজ এবং আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভা কী?

বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) হলো একটি সভা, যা প্রত্যেক আর্থিক বছরের শেষে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য আয়োজন করা হয়। এতে কোম্পানির আর্থিক অবস্থা, পরিচালকদের প্রতিবেদন, লভ্যাংশ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং নতুন পরিচালক নিয়োগের বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভার আলোচ্যসূচি কী?

সভায় আলোচনার জন্য যে বিষয়গুলি প্রস্তাবিত হয়, তা সভার আলোচ্যসূচি হিসেবে পরিচিত। এটি আগে থেকেই প্রস্তুত করা হয় এবং সভার সকল সদস্যদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া হয়, যাতে তারা সভায় আলোচনা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে।

"খ" বিভাগ

1. কোম্পানি নিবন্ধনের ফলাফল:

কোম্পানি নিবন্ধন করলে এটি একটি আইনি সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার নিজস্ব পরিচয় থাকে এবং শেয়ারহোল্ডারদের ব্যক্তিগত দায় থেকে পৃথক হয়। নিবন্ধনের ফলে কোম্পানি বিভিন্ন সুবিধা পায়, যেমন:

- আইনি সত্তা: কোম্পানি একটি পৃথক আইনি সত্তা হিসাবে গণ্য হয়।
- নিত্যধারাবাহিকতা: কোম্পানি শেয়ারহোল্ডার বা পরিচালকদের মৃত্যু সত্ত্বেও স্থায়ীভাবে চলতে থাকে।
- সম্পত্তি অধিকার: কোম্পানি নিজস্ব সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে।
- দায়বদ্ধতা সীমিতকরণ: শেয়ারহোল্ডারদের দায়বদ্ধতা তাদের শেয়ারের মূলধন পর্যন্ত সীমিত থাকে।
- চুক্তি সম্পাদন ক্ষমতা: নিবন্ধিত কোম্পানি নিজের নামে চুক্তি করতে পারে।

2. স্মারকলিপি এবং পরিমেল নিয়মাবলির মধ্যে পার্থক্য:

বিষয়	স্মারকলিপি (Memorandum of Association)	পরিমেল নিয়মাবলি (Articles of Association)
সংজ্ঞা	কোম্পানির গঠন এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণকারী প্রাথমিক দলিল।	কোম্পানির পরিচালনা এবং পরিচালকদের দায়িত্ব নির্ধারণকারী নিয়মাবলি।
ধরন	বাহ্যিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন কোম্পানির উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব।	অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন পরিচালকদের ক্ষমতা এবং শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার।
পরিবর্তনযোগ্যতা	আদালতের অনুমতি ছাড়া পরিবর্তন করা যায় না।	শেয়ারহোল্ডারদের অনুমতি নিয়ে সহজে পরিবর্তন করা যায়।
প্রয়োজনীয়তা	এটি কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য বাধ্যতামূলক।	এটি কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

3. শেয়ার ও ঋণপত্রের মধ্যে পার্থক্য:

বিষয়	শেয়ার (Share)	ঋণপত্র (Debenture)
মালিকানা	শেয়ারহোল্ডার কোম্পানির মালিকানা অংশীদার।	ঋণপত্রধারী কোম্পানিকে ঋণ দেয় এবং মালিকানা পায় না।
ফলাফল	শেয়ারহোল্ডাররা লভ্যাংশ পেয়ে থাকে।	ঋণপত্রধারীরা সুদ পেয়ে থাকে।
দায়িত্ব	শেয়ারহোল্ডারদের দায়বদ্ধতা সীমিত।	ঋণপত্রধারীদের ঋণ ফেরত পাওয়ার অধিকার আছে।
সম্মেলন	শেয়ারহোল্ডারদের ভোটাধিকার থাকে।	ঋণপত্রধারীদের ভোটাধিকার থাকে না।

4. কোম্পানির সচিবকে অপসারণ করা যায়:

কোম্পানির সচিবকে অপসারণ করা যেতে পারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যা কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নীতি, আইন এবং নিয়মের ওপর নির্ভর করে। সচিবকে অপসারণের কিছু সাধারণ পদ্ধতি নিম্নরূপ:

- বোর্ডের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে: পরিচালনা পর্ষদের (Board of Directors) একটি সভায় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সচিবকে অপসারণ করা যায়। সচিবের অপসারণের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিচালকদের সম্মতি প্রয়োজন হতে পারে।
- শেয়ারহোল্ডারদের অনুমতি: কিছু ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমতি নিয়ে সচিবকে অপসারণ করা হয়, বিশেষত যদি কোম্পানির নিয়মাবলিতে শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতি প্রয়োজন বলে উল্লেখ থাকে।

3. **অভ্যন্তরীণ নিয়মাবলি অনুযায়ী:** কোম্পানির **পরিমেল নিয়মাবলি (Articles of Association)** বা অন্যান্য অভ্যন্তরীণ নীতিমালায় সচিব অপসারণের প্রক্রিয়া ও শর্তাবলী উল্লেখ থাকতে পারে। সেই অনুযায়ীও অপসারণ করা যায়।
4. **আইনি ব্যবস্থা:** যদি সচিব তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন বা কোনো অনিয়ম করেন, তবে আইন অনুযায়ী বা আদালতের নির্দেশে তাকে অপসারণ করা যেতে পারে।

সচিবকে অপসারণের কারণ ও প্রক্রিয়া কোম্পানির নিয়মাবলি এবং দেশের প্রযোজ্য কোম্পানি আইনের অধীনে পরিচালিত হয়।

5. প্রবর্তকের কার্যাবলি:

1. কোম্পানি গঠনের আইনি প্রক্রিয়া পরিচালনা করা।
2. প্রাথমিক শেয়ারধারীদের নির্বাচন করা।
3. কোম্পানির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা।
4. কোম্পানির নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলপত্র প্রস্তুত করা।

6. কোম্পানির ঋণ গ্রহণ ক্ষমতার উপর বিধি-নিষেধ:

কোম্পানির ঋণ গ্রহণ ক্ষমতার উপর বিধি-নিষেধ বিভিন্ন কারণে আরোপিত হতে পারে, যার মধ্যে আইনি বিধি-বিধান, কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নীতি এবং ঋণদাতাদের শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রধান বিধি-নিষেধগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

. স্মারকলিপির ধারা (Memorandum of Association):

- কোম্পানির **স্মারকলিপিতে (MOA)** ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে পারে। এতে কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় এবং কী পরিমাণ ঋণ নেওয়া যাবে, তা নির্দিষ্ট করা হতে পারে।
- যদি স্মারকলিপিতে ঋণ গ্রহণের কোনো সীমা উল্লেখ থাকে, তাহলে কোম্পানি সেই সীমার বাইরে গিয়ে ঋণ নিতে পারে না।

. পরিমেল নিয়মাবলি (Articles of Association):

- কোম্পানির **পরিমেল নিয়মাবলিতে (AOA)** ঋণ গ্রহণের অভ্যন্তরীণ নীতিমালা নির্ধারণ করা হতে পারে। এই নিয়মাবলি পরিচালকদের ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে।
- পরিচালকেরা কীভাবে এবং কী পরিমাণ ঋণ নিতে পারেন, তা এই নিয়মাবলির মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়।

. শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন:

- কিছু ক্ষেত্রে, বড় পরিমাণ ঋণ নেওয়ার আগে **শেয়ারহোল্ডারদের অনুমতি** নিতে হয়। শেয়ারহোল্ডারদের অনুমতি ছাড়াই পরিচালকেরা অতিরিক্ত ঋণ নিতে পারেন না।
- শেয়ারহোল্ডারদের সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং তাদের সম্মতির ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

. আইনি বিধিনিষেধ:

- কিছু দেশে বা অঞ্চলে **কোম্পানি আইন** অনুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার বেশি ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপিত থাকে। আইনি নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট ঋণের সীমা লঙ্ঘন করা যায় না।

- এছাড়াও, কিছু অর্থনৈতিক খাতের কোম্পানির জন্য বিশেষ বিধিনিষেধ থাকতে পারে।

. ঋণদাতাদের শর্তাবলী:

- ঋণদাতারা কোম্পানিকে ঋণ দেওয়ার সময় কিছু **শর্তাবলী** আরোপ করতে পারেন। এই শর্তগুলোর মধ্যে ঋণ গ্রহণের সীমা, সুদের হার, এবং ঋণ পরিশোধের সময়সীমা উল্লেখ থাকতে পারে।
- যদি কোম্পানি ঋণদাতার শর্তাবলী লঙ্ঘন করে, তবে তারা ঋণ দেওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত করতে পারে বা শর্ত লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি আরোপ করতে পারে।

. দায়বদ্ধতা সীমিতকরণ:

- কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের দায়বদ্ধতা সীমিত করা থাকে। ফলে ঋণ গ্রহণের সীমা সেই অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, যাতে শেয়ারহোল্ডারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে।

. কোম্পানির আর্থিক অবস্থা:

- কোম্পানির নিজস্ব **আর্থিক অবস্থা**, যেমন লাভক্ষতির হিসাব, নগদ প্রবাহ এবং আয়, ঋণ গ্রহণের সীমা নির্ধারণে প্রভাব ফেলে। ঋণদাতারা সাধারণত কোম্পানির আর্থিক সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে ঋণ মঞ্জুর করে।

উপসংহার: কোম্পানির ঋণ গ্রহণ ক্ষমতা বিভিন্ন দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন কোম্পানির স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলি, শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন, আইনগত বিধি, এবং ঋণদাতাদের শর্তাবলী। এগুলো কোম্পানির সুষ্ঠু অর্থনৈতিক কার্যক্রম বজায় রাখতে এবং ঋণগ্রহণের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

7. বিধিবদ্ধ সভা ও বার্ষিক সাধারণ সভার মধ্যে পার্থক্য:

বিষয়	বিধিবদ্ধ সভা (Statutory Meeting)	বার্ষিক সাধারণ সভা (Annual General Meeting)
সময়	কোম্পানি গঠনের পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।	প্রতি অর্থবছরে একবার অনুষ্ঠিত হয়।
উদ্দেশ্য	প্রারম্ভিক কার্যক্রমের ওপর আলোচনার জন্য হয়।	পরিচালকদের প্রতিবেদন অনুমোদন এবং অন্যান্য সাধারণ বিষয়।
বাধ্যতামূলকতা	নতুন কোম্পানির জন্য বাধ্যতামূলক।	সকল নিবন্ধিত কোম্পানির জন্য বাধ্যতামূলক।

8. আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক অবসারণের বিধান:

- কোম্পানি দেউলিয়া হলে: কোম্পানির ঋণ মেটানোর সামর্থ্য না থাকলে।
- অপর্যাপ্ত কার্যক্রম: কোম্পানির কার্যক্রম অনুপস্থিত থাকলে।
- নির্ধারিত শর্ত লঙ্ঘন: কোম্পানির নিয়মাবলি লঙ্ঘিত হলে।
- শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ: শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষে আদালতের আদেশের মাধ্যমে।

9. হোল্ডিং কোম্পানি ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য:

বিষয়	হোল্ডিং কোম্পানি (Holding Company)	সাবসিডিয়ারি কোম্পানি (Subsidiary Company)
সংজ্ঞা	অন্যান্য কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।	হোল্ডিং কোম্পানির অধীনে পরিচালিত হয়।
নিয়ন্ত্রণ	মূল কোম্পানি হিসেবে কাজ করে।	অন্য কোম্পানির অধীনস্থ থাকে।
শেয়ার মালিকানা	হোল্ডিং কোম্পানি সাবসিডিয়ারির শেয়ার মালিক।	সাবসিডিয়ারি কোম্পানির নিজস্ব পরিচালনা থাকে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণাধীন।

10. শেয়ার ও স্টকের মধ্যে পার্থক্য:

বিষয়	শেয়ার (Share)	স্টক (Stock)
সংজ্ঞা	কোম্পানির মূলধনের ছোট একক।	কোম্পানির মূলধনের বৃহত্তর একক।
ট্রেডিং	সাধারণত পুরো ইউনিট হিসেবে ট্রেড করা হয়।	আংশিকভাবে ট্রেড করা সম্ভব।
স্বাভাবিকীকরণ	নতুন কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করে।	শেয়ারগুলো যখন পুরোপুরি মেটানো হয়, তখন স্টকে রূপান্তরিত হয়।

"গ"- বিভাগ

*****(ক) কর্পোরেট আইন কী?**

কর্পোরেট আইন হলো সেই আইন বা বিধিবিধান, যা কোম্পানির গঠন, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং ভাঙন নিয়ন্ত্রণ করে। কর্পোরেট আইন কোম্পানির সমস্ত ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক এবং ব্যবসায়িক লেনদেন, শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার, কোম্পানির কর, এবং অন্যান্য আর্থিক বিষয়ে গাইডলাইন সরবরাহ করে।

(খ) বাংলাদেশে বিদেশী কোম্পানির নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধি- বিধান ব্যাখ্যা কর:

বাংলাদেশে বিদেশী কোম্পানির নিবন্ধন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যা কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (The Companies Act, 1994) অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এই নিবন্ধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদেশী কোম্পানি বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। নিবন্ধন সংক্রান্ত মূল বিধি-বিধানগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

১. নিবন্ধনের আবশ্যিকতা:

বাংলাদেশে কোনো বিদেশী কোম্পানি ব্যবসা পরিচালনা করতে চাইলে তাকে বাংলাদেশে নিবন্ধিত হতে হবে। এটি কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ৩৭০ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত।

২. নিবন্ধন প্রক্রিয়া:

বিদেশী কোম্পানির নিবন্ধনের জন্য কোম্পানি রেজিস্ট্রারের (Registrar of Joint Stock Companies & Firms) কাছে আবেদন করতে হয়। এই আবেদন প্রক্রিয়ায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও দলিলপত্র জমা দিতে হয়, যেমন:

- কোম্পানির স্মারকলিপি (Memorandum of Association) এবং সংবিধি (Articles of Association)।
- প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত ঠিকানা ও যোগাযোগের বিবরণ।
- কোম্পানির বোর্ডের সদস্যদের তালিকা এবং তাদের ঠিকানা।
- কোম্পানির কার্যক্রম ও ব্যবসার প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য।
- কোম্পানির মূল নিবন্ধন সনদের অনুলিপি।

৩. রেজিস্ট্রারের সাথে নথিপত্র জমা:

বিদেশী কোম্পানির জন্য কিছু নির্দিষ্ট নথিপত্র জমা দিতে হয়, যেমন:

- কোম্পানির মূল নিবন্ধনের অনুলিপি।
- স্মারকলিপি ও সংবিধির অনুলিপি।
- বাংলাদেশে কোম্পানির স্থায়ী ঠিকানার বিবরণ।
- কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের নাম, ঠিকানা ও দায়িত্ব।
- স্থানীয় এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি।

৪. নিবন্ধন ফি:

রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি প্রদান করতে হয়, যা কোম্পানির মূলধন ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

৫. শাখা বা লিয়াজেঁ অফিস:

বিদেশী কোম্পানি বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ ব্যবসা পরিচালনা না করে শুধুমাত্র শাখা অফিস বা লিয়াজেঁ অফিস খুলতে পারে। এজন্যও কোম্পানি রেজিস্ট্রারের কাছে নিবন্ধন করতে হয় এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) থেকে অনুমতি নিতে হয়।

৬. বার্ষিক রিটার্ন জমা:

বিদেশী কোম্পানিকে প্রতি বছর রেজিস্ট্রারের কাছে বার্ষিক রিপোর্ট বা রিটার্ন জমা দিতে হয়, যেখানে কোম্পানির আর্থিক বিবরণী এবং কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকে।

৭. আইনগত দায়িত্ব:

বাংলাদেশে নিবন্ধিত বিদেশী কোম্পানি স্থানীয় আইন মেনে চলতে বাধ্য, এবং তাদের স্থানীয় আইন অনুযায়ী কর প্রদান করতে হয়।

৮. কোম্পানি বন্ধ বা সমাপ্তি:

যদি বিদেশী কোম্পানি বাংলাদেশে তার কার্যক্রম বন্ধ করতে চায়, তবে তাকে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে এবং রেজিস্ট্রারকে যথাযথ তথ্য জানাতে হবে।

এই বিধি-বিধানের মাধ্যমে বিদেশী কোম্পানি বাংলাদেশে বৈধভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এবং দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে।

(গ) পাবলিক লিমিটেড ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির পার্থক্য:

বিষয়	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
শেয়ারহোল্ডার সংখ্যা	সর্বনিম্ন ৭ জন, সর্বাধিক সীমা নেই।	সর্বনিম্ন ২ জন, সর্বাধিক ৫০ জন।
শেয়ার বিক্রয়	প্রকাশ্য বাজারে শেয়ার বিক্রি করা যায়।	শেয়ার হোল্ডারদের অনুমতি ছাড়া শেয়ার বিক্রি করা যায় না।
শেয়ার স্থানান্তর	সহজে স্থানান্তরযোগ্য।	স্থানান্তরে বাধা থাকে।
বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM)	বাধ্যতামূলক।	বাধ্যতামূলক নয়।

***ক) কোম্পানির চিরন্তন অস্তিত্ব বলতে কী বুঝ?

কোম্পানির চিরন্তন অস্তিত্ব বলতে বোঝায় যে কোম্পানি তার সদস্য বা পরিচালকদের ব্যক্তিগত জীবনের উপর নির্ভরশীল নয়। সদস্যদের মৃত্যু, অবসর বা অপসারণের ফলে কোম্পানির অস্তিত্ব শেষ হয় না। কোম্পানি তার আইনি পরিচয় ধরে রাখে যতক্ষণ না এটি ভেঙে দেওয়া হয়।

(খ) 'নিবন্ধনপত্র কোম্পানির জন্মের ছাড়পত্র' আলোচনা কর:

কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি হলো **নিবন্ধনপত্র (Certificate of Incorporation)**। এটিকে "কোম্পানির জন্মের ছাড়পত্র" বলা হয়, কারণ এই নথি পাওয়ার মাধ্যমে একটি কোম্পানি আইনি সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় এবং এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করার ক্ষমতা লাভ করে। বাংলাদেশে কোম্পানির নিবন্ধন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (The Companies Act, 1994) অনুযায়ী।

নিবন্ধনপত্রের গুরুত্ব:

- আইনি সত্তা প্রতিষ্ঠা:** নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর একটি কোম্পানি পৃথক আইনি সত্তা হিসাবে গণ্য হয়। অর্থাৎ, কোম্পানি নিজস্ব নামে চুক্তি করতে, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং মামলা-মোকদ্দমা করতে পারে। কোম্পানির মালিকদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব থেকে কোম্পানির সম্পদ ও কার্যক্রম পৃথক থাকে।
- ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করা:** নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পরই কোম্পানি আইনগতভাবে ব্যবসা পরিচালনা শুরু করতে পারে। এর আগে কোনো কোম্পানি ব্যবসা শুরু করতে পারে না।

৩. **আইনগত সুরক্ষা:** নিবন্ধনপত্র প্রাপ্তির মাধ্যমে কোম্পানি আইনগত সুরক্ষা লাভ করে। এটি কোম্পানির আইন অনুযায়ী সকল কাজকর্ম পরিচালনার অধিকার দেয় এবং কোম্পানির নাম ব্যবহার করে ব্যবসা পরিচালনা নিশ্চিত করে।

৪. **পরিচালনা পর্যদ গঠন ও কার্যাবলি:** নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর কোম্পানি পরিচালনা পর্যদ গঠন করতে পারে, শেয়ার ইস্যু করতে পারে এবং অন্যান্য কার্যাবলি পরিচালনা করতে পারে।

নিবন্ধনপত্র পাওয়ার প্রক্রিয়া:

১. **আবেদন জমা:** কোম্পানির স্মারকলিপি (Memorandum of Association), সংবিধি (Articles of Association), এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র কোম্পানি রেজিস্ট্রারের (Registrar of Joint Stock Companies & Firms) কাছে জমা দিতে হয়।

২. **নথি যাচাই ও অনুমোদন:** রেজিস্ট্রার আবেদনপত্র যাচাই করে এবং সমস্ত আইনগত শর্ত পূরণ হলে নিবন্ধনপত্র প্রদান করে।

৩. **নিবন্ধনপত্র ইস্যু:** রেজিস্ট্রার নিবন্ধনপত্র ইস্যু করার মাধ্যমে কোম্পানিকে আইনি সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

নিবন্ধনপত্রের আইনি প্রভাব:

- আইনগত অস্তিত্ব:** নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর কোম্পানি একটি পৃথক সত্তা হিসেবে গঠিত হয় এবং এটি প্রতিষ্ঠার পর কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার, পরিচালক বা প্রতিষ্ঠাতাদের থেকে পৃথকভাবে আইনি ক্ষমতা লাভ করে।
- স্থায়িত্ব:** নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর কোম্পানি স্থায়ী হয়ে যায় এবং এটি কেবল আইনের মাধ্যমে বন্ধ হতে পারে। এর অর্থ, কোম্পানি পরিচালকদের মৃত্যু বা পদত্যাগের পরেও টিকে থাকে।

উপসংহার:

নিবন্ধনপত্র কোম্পানির "জন্মের ছাড়পত্র" কারণ এর মাধ্যমে একটি কোম্পানি আইনগতভাবে জন্ম নেয় এবং ব্যবসা পরিচালনা করার অধিকার অর্জন করে। এটি কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করার মূল নথি এবং এর মাধ্যমে কোম্পানি একটি পৃথক আইনি সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(গ) নিবন্ধিত কোম্পানি ও বিধিবদ্ধ কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য:

নিবন্ধিত কোম্পানি এবং বিধিবদ্ধ কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য নিচের টেবিলে তুলে ধরা হলো:

বিষয়	নিবন্ধিত কোম্পানি	বিধিবদ্ধ কোম্পানি
সংজ্ঞা	কোম্পানি আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত হয়ে একটি পৃথক আইনি সত্তা।	বিশেষ আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি।
নিবন্ধন প্রক্রিয়া	কোম্পানি রেজিস্ট্রারের কাছে নিবন্ধন করতে হয়।	সরকারের বিশেষ অনুমোদন নিয়ে নিবন্ধিত হতে হয়।
আইনগত অধিকার	আইনের অধীনে ব্যবসা পরিচালনা করার অধিকার পায়।	নির্দিষ্ট আইন বা বিধি অনুযায়ী পরিচালনা করতে হয়।

গঠন	সাধারণত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।	কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য বা সেবা প্রদানের জন্য গঠিত হয়।
কর্মপদ্ধতি	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী পরিচালিত হয়।	সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়।
মূলধন	শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে মূলধন বিতরণ করতে পারে।	সরকারী বা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন হতে পারে।
অর্থনৈতিক দায়িত্ব	কোম্পানি দেউলিয়া হলে শেয়ারহোল্ডারদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ।	দেউলিয়া হলে কর্তৃপক্ষের বা সরকারের দায়িত্ব বেশি।
কাজের পরিধি	মূলত ব্যবসায়িক কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ।	বিভিন্ন সামাজিক, পরিবেশগত বা রাষ্ট্রীয় সেবায় জড়িত।

সারসংক্ষেপ:

নিবন্ধিত কোম্পানি হলো সাধারণত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং কোম্পানি আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়, যেখানে বিধিবদ্ধ কোম্পানি বিশেষ আইন বা বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং সাধারণত বিশেষ উদ্দেশ্য বা সেবা প্রদান করে।

***ক) কোম্পানির নিরীক্ষকের যোগ্যতাগুলো কী কী?

১. নিরীক্ষককে আইসিএবি (ICAB) থেকে অনুমোদিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হতে হবে।
২. নিরীক্ষককে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে।
৩. নিরীক্ষককে কোম্পানি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতিমালা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।
৪. কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার বা পরিচালক না হওয়া বাধ্যতামূলক।

(খ) কোম্পানির হিসাব নিরীক্ষকের পদমর্যাদা সম্পর্কে লিখ:

কোম্পানির হিসাব নিরীক্ষক (Auditor) একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ, যিনি কোম্পানির আর্থিক বিবরণী ও হিসাবের সঠিকতা নিশ্চিত করেন। এই পদমর্যাদা কোম্পানির সামগ্রিক আর্থিক সুস্থিতি ও স্বচ্ছতার জন্য অপরিহার্য। হিসাব নিরীক্ষকের পদমর্যাদা সম্পর্কিত কিছু মূল দিক নিচে আলোচনা করা হলো:

১. আইনি স্বীকৃতি:

- হিসাব নিরীক্ষক কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর আওতায় কাজ করেন এবং তাদের নিয়োগ, দায়িত্ব ও দায়িত্বের ক্ষেত্রগুলি আইন দ্বারা নির্ধারিত।
- একটি কোম্পানির জন্য নিরীক্ষকের পদমর্যাদা স্থাপন করা হয় যাতে তারা আর্থিক প্রতিবেদনের বৈধতা যাচাই করতে পারে।

২. স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা:

- হিসাব নিরীক্ষককে স্বাধীনভাবে কাজ করতে হয়, যাতে তাদের মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন কোম্পানির স্বার্থে পক্ষপাতদুষ্ট না হয়।
- নিরীক্ষককে কোম্পানির পরিচালকদের থেকে দূরে থাকতে হবে যাতে তারা সঠিক ও নির্ভুল ফলাফল দিতে পারেন।

৩. পেশাদারিত্ব:

- হিসাব নিরীক্ষককে পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করতে হয় এবং তাদের কাজের প্রতি দায়িত্বশীল হতে হয়।
- তাদের অবশ্যই হিসাব নিরীক্ষা, হিসাব সম্পর্কিত নীতি এবং আইন সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে।

৪. রিপোর্টিং ও মূল্যায়ন:

- হিসাব নিরীক্ষকের প্রধান কাজ হলো কোম্পানির আর্থিক বিবরণী মূল্যায়ন করা এবং একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।
- তারা কোম্পানির হিসাবের সঠিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করেন এবং সমস্যা বা অসঙ্গতি থাকলে তা রিপোর্ট করেন।

৫. কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ও শেয়ারহোল্ডারদের জন্য পরামর্শ:

- হিসাব নিরীক্ষকরা কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য আর্থিক বিশ্লেষণ ও পরামর্শ প্রদান করেন।
- তাদের মূল্যায়ন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সহায়ক হয়।

৬. নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মূল্যায়ন:

- হিসাব নিরীক্ষকরা কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন এবং যে কোনো দুর্বলতা বা ঝুঁকির বিষয়গুলি চিহ্নিত করেন।
- তারা আর্থিক বিবরণীর নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করেন।

৭. দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা:

- হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব হলো সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যান সরবরাহ করা, যাতে কোম্পানির আর্থিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।
- তারা আইনগতভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে বাধ্য।

উপসংহার:

কোম্পানির হিসাব নিরীক্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ, যার মাধ্যমে আর্থিক স্বচ্ছতা, নৈতিকতা এবং স্বীকৃতির ভিত্তিতে কোম্পানির বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। তাদের স্বাধীনতা, পেশাদারিত্ব এবং দায়িত্বশীলতা কোম্পানির আর্থিক সুস্থিতির জন্য অপরিহার্য।

(গ) কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু:

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন (Board of Directors' Report) হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি যা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রস্তুত করা হয়। এটি কোম্পানির কার্যক্রম, আর্থিক ফলাফল, এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। নিচে প্রতিবেদনটির মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলো:

১. কোম্পানির কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ:

- বছরের মধ্যে কোম্পানির পরিচালিত কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ।

- গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, উদ্যোগ এবং অর্জনগুলি উল্লেখ করা হয়।

২. আর্থিক ফলাফল:

- কোম্পানির লাভ-ক্ষতি, ব্যালেন্স শিট এবং নগদ প্রবাহের বিবরণ।
- আর্থিক পরিস্থিতি, আয় ও ব্যয়ের বিশ্লেষণ।

৩. পরিচালনা পর্ষদের গঠন:

- পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের নাম, পদবী এবং যোগ্যতা।
- নতুন সদস্যের যোগদান এবং পদত্যাগের তথ্য।

৪. কর্পোরেট গভর্নেন্স:

- কোম্পানির কর্পোরেট গভর্নেন্স নীতি এবং এর কার্যকারিতা।
- নৈতিকতা, স্বচ্ছতা এবং শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার সম্পর্কে তথ্য।

৫. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- কোম্পানির ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ও পরিকল্পনা।
- নতুন উদ্যোগ, বাজার প্রবেশ এবং ব্যবসায়িক কৌশল।

৬. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:

- ব্যবসায়িক ঝুঁকি এবং তাদের মোকাবেলার জন্য ব্যবস্থাপনা কৌশল।
- ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি।

৭. লভ্যাংশ ও শেয়ার হোল্ডারদের তথ্য:

- শেয়ারহোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশের ঘোষণা।
- কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি দায়িত্ব এবং প্রতিশ্রুতি।

৮. সামাজিক ও পরিবেশগত দায়িত্ব:

- কোম্পানির সামাজিক ও পরিবেশগত দায়িত্ব এবং কার্যক্রম।
- সমাজ উন্নয়নে অবদান এবং পরিবেশ সুরক্ষার প্রচেষ্টা।

৯. নিরীক্ষা প্রতিবেদন:

- নিরীক্ষকের রিপোর্ট ও মন্তব্য।

- নিরীক্ষক কর্তৃক উল্লেখিত যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১০. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- কোম্পানির পরিচালনা, আইনগত বাধ্যবাধকতা এবং অন্যান্য বিষয়।

উপসংহার:

কোম্পানির পরিচালনা পর্যদের প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত, যা কোম্পানির বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে। এটি কোম্পানির স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য অপরিহার্য।

(ক) বিবরণপত্রের অসত্য বিবৃতি বলতে কী বুঝ?

বিবরণপত্রের অসত্য বিবৃতি বলতে বোঝায় এমন তথ্য যা ভুল, বিভ্রান্তিকর বা অসম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং যা বিনিয়োগকারীদের প্রভাবিত করতে পারে। এতে বিনিয়োগকারীরা ভুল ধারণা পায় এবং আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

(খ) বিবরণপত্রে মিথ্যা বিবরণের জন্য পরিচালকের দায়সমূহ:

বিবরণপত্র (Prospectus) একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি যা একটি কোম্পানির শেয়ার বা সিকিউরিটি ইস্যু করার সময় প্রকাশ করা হয়। এতে কোম্পানির ব্যবসা, আর্থিক অবস্থা, এবং পরিচালকদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। যদি বিবরণপত্রে মিথ্যা বিবরণ থাকে, তবে পরিচালকদের উপর কিছু আইনগত ও নৈতিক দায়িত্ব পড়ে। নিচে এসব দায়িত্ব আলোচনা করা হলো:

১. আইনগত দায়িত্ব:

মিথ্যা বা প্রতারণামূলক তথ্যের জন্য দায়বদ্ধতা: যদি কোম্পানির বিবরণপত্রে ভুল তথ্য বা মিথ্যা বিবরণ দেওয়া হয়, তবে কোম্পানির পরিচালকরা আইনের অধীনে দায়বদ্ধ হতে পারেন। বাংলাদেশে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী, পরিচালকেরা মিথ্যা বিবরণের জন্য দায়ী।

২. ক্ষতিপূরণের দাবি:

শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষতিপূরণ: যদি শেয়ারহোল্ডাররা মিথ্যা বিবরণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তবে তারা পরিচালকদের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন। শেয়ারহোল্ডাররা আদালতে অভিযোগ জানিয়ে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন।

৩. অপরাধমূলক দায়িত্ব:

অপরাধমূলক অভিযোগ: মিথ্যা বিবরণের কারণে যদি কোম্পানি বা শেয়ারহোল্ডারদের কোনো ক্ষতি হয়, তবে পরিচালকদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অভিযোগ দায়ের করা হতে পারে। এতে তারা জেল জরিমানার মুখোমুখি হতে পারেন।

৪. বিশ্বাসঘাতকতা:

বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ: পরিচালকেরা যদি মিথ্যা বিবরণের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের বা বিনিয়োগকারীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তবে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এটি কোম্পানির নৈতিক দায়িত্বের লঙ্ঘন।

৫. পেশাদারিত্বের লঙ্ঘন:

পেশাদারিত্বের অভাব: একটি কোম্পানির পরিচালক হিসেবে তাদের পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে হয়। মিথ্যা বিবরণ দিলে তা তাদের পেশাদারিত্বের অভাব নির্দেশ করে, যা কোম্পানির সুনাম ক্ষুণ্ণ করে।

৬. শেয়ারহোল্ডারদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব:

বিশ্বাসের অভাব: মিথ্যা বিবরণের ফলে শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির উপর বিশ্বাস হারাতে পারেন, যা কোম্পানির বাজারমূল্য ও সুনামকে প্রভাবিত করে।

উপসংহার:

বিবরণপত্রে মিথ্যা বিবরণের জন্য পরিচালকদের উপর গুরুতর আইনগত ও নৈতিক দায়িত্ব থাকে। এটি কোম্পানির স্বচ্ছতা, সুনাম এবং শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি পরিচালকদের দায়িত্বের উপর প্রভাব ফেলে। ফলে, পরিচালকদের উচিত সঠিক তথ্য নিশ্চিত করা এবং আইন মেনে চলা।

(গ) অবলেখকের কমিশন ও দালালির মধ্যে পার্থক্য:

অবলেখকের কমিশন এবং দালালির মধ্যে পার্থক্য নিচের টেবিলে তুলে ধরা হলো:

বিষয়	অবলেখকের কমিশন	দালালির
সংজ্ঞা	অবলেখকের কমিশন হলো একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য নিযুক্ত অবলেখকের দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ।	দালালি হলো পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ে মধ্যস্থতা করার জন্য কমিশন।
মূল কাজ	অবলেখক হিসেবে কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট কমিশন গ্রহণ করা।	পণ্য বা সেবা লেনদেনে মধ্যস্থতা করা।
পারিশ্রমিক	কাজের ভিত্তিতে কমিশন নির্ধারিত হয়, যা পূর্বনির্ধারিত।	লেনদেনের ভিত্তিতে কমিশন নির্ধারিত হয়।
কর্মসংস্থান	অবলেখক সাধারণত একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হন।	দালাল স্বাধীনভাবে কাজ করেন বা বিভিন্ন কোম্পানির সাথে যুক্ত থাকেন।
আইনি দায়িত্ব	অবলেখক কর্তৃপক্ষের আইন অনুসারে কাজ করে এবং দায়িত্বশীল।	দালাল তাদের কাজের জন্য নিয়মিত কমিশন পায়, তবে দায়িত্ব থাকে মধ্যস্থতার।
পদ্ধতি	কমিশন সাধারণত লেখালেখি বা নথি তৈরির জন্য হয়।	কমিশন পণ্য বা সেবার লেনদেন সম্পন্ন করার জন্য হয়।
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি	অবলেখক সাধারণত আইনগত বা প্রশাসনিক কাজের জন্য নিযুক্ত হন।	দালাল ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য নিযুক্ত হন।

সারসংক্ষেপ:

অবলেখকের কমিশন হলো নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রাপ্ত অর্থ, যেখানে দালালির কমিশন হলো পণ্য বা সেবা লেনদেনে মধ্যস্থতা করার জন্য প্রাপ্ত অর্থ। অবলেখক সাধারণত একটি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হয়, তবে দালাল স্বাধীনভাবে কাজ করেন।

***ক) কোম্পানির প্রবর্তক বলতে কী বুঝ?

প্রবর্তক হলো সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি দল, যারা একটি নতুন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং কোম্পানি গঠনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। প্রবর্তকরা কোম্পানির পরিকল্পনা, নথিপত্র এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে।

(খ) প্রবর্তকের দায় ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা কর:

প্রবর্তক (Promoter) হলো সেই ব্যক্তি বা দল, যারা একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করার প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারা কোম্পানির গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এবং কোম্পানির জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়। প্রবর্তকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য কোম্পানি গঠনের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং নিচে এই বিষয়ে আলোচনা করা হলো:

প্রবর্তকের দায়:

১. বিশ্বাসভঙ্গের দায় (Fiduciary Duty):

প্রবর্তকের প্রধান দায়িত্ব হলো, তারা কোম্পানি এবং এর শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি আস্থা এবং সততা বজায় রাখবে। তারা নিজেদের স্বার্থে কাজ করতে পারবেন না বরং কোম্পানির সঠিক স্বার্থে কাজ করতে হবে। কোনো ধরনের লুকোচুরি বা ভুল তথ্য দেওয়া আইনত দণ্ডনীয়।

২. মিথ্যা বিবরণের দায়:

প্রবর্তক যদি কোম্পানির গঠন প্রক্রিয়ার সময় বা বিবরণপত্রে কোনো মিথ্যা বা ভুল তথ্য প্রদান করে, তবে তারা দায়ী হবে। শেয়ারহোল্ডার বা বিনিয়োগকারীরা যদি এই ধরনের মিথ্যা বিবরণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তবে তারা আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন।

৩. ব্যক্তিগত দায় (Personal Liability):

কোম্পানি নিবন্ধনের আগে প্রবর্তকরা যে কোনো চুক্তি করেন বা লেনদেন করেন, তা তাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বে থেকে সম্পন্ন করতে হয়। অর্থাৎ, কোম্পানি গঠনের আগে প্রবর্তকদের ব্যক্তিগত দায় থাকে এবং কোম্পানির নিবন্ধনের পরেই তারা কোম্পানির নামে লেনদেন করতে পারবেন।

৪. নিরীক্ষা ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন:

প্রবর্তকের কাজের হিসাব এবং ব্যয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করতে হয়। কোনো আর্থিক ভুল বা গোপনীয়তা থাকলে তারা দায়ী হতে পারে।

প্রবর্তকের কর্তব্য:

১. কোম্পানি গঠনের প্রাথমিক কাজ:

প্রবর্তকের মূল দায়িত্ব হলো, একটি কোম্পানির নিবন্ধন সম্পন্ন করা। তারা কোম্পানির জন্য নাম নির্বাচন করে, নিবন্ধনপত্র তৈরি করে, এবং প্রতিষ্ঠানের আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে।

২. বিবরণপত্র প্রস্তুত:

কোম্পানির প্রথম শেয়ার ইস্যুর সময় প্রবর্তকেরা বিবরণপত্র প্রস্তুত করেন। এতে কোম্পানির আর্থিক অবস্থা, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, এবং পরিচালনা সম্পর্কে সঠিক তথ্য থাকতে হবে।

৩. পুঁজি সংগ্রহের ব্যবস্থা:

প্রবর্তকের অন্যতম কাজ হলো কোম্পানির পুঁজি সংগ্রহ করা। তারা বিনিয়োগকারীদের সাথে আলোচনা করে শেয়ার বিক্রি বা সিকিউরিটিজ ইস্যু করার মাধ্যমে কোম্পানির জন্য অর্থ সংগ্রহ করে।

৪. প্রথম পরিচালনা পর্যদ গঠন:

প্রবর্তক কোম্পানির প্রথম পরিচালনা পর্যদ গঠন করেন। এই পরিচালকরাই পরবর্তী সময়ে কোম্পানির দৈনন্দিন পরিচালনা দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

৫. প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন:

প্রবর্তক কোম্পানির জন্য প্রয়োজনীয় জমি, অফিস, এবং অন্যান্য সম্পত্তি চুক্তির মাধ্যমে সংগ্রহ করেন। এছাড়া কোম্পানির প্রথম কার্যক্রম শুরু করার জন্য সব ধরনের সরঞ্জাম ও সেবা নিশ্চিত করেন।

৬. ব্যবসায়িক নথি প্রস্তুত:

প্রবর্তকরা নিবন্ধনপত্র (Certificate of Incorporation) এবং স্মারকলিপি (Memorandum of Association) প্রস্তুত করে, যা কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার:

প্রবর্তকের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত গুরুতর এবং দায়িত্বশীল। তারা কোম্পানির প্রাথমিক ভিত্তি গড়ে তোলেন এবং কোম্পানির নিবন্ধন, পুঁজি সংগ্রহ, এবং পরিচালনা পর্যদ গঠনের মূল কাজ সম্পন্ন করেন। তবে প্রবর্তকদের সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হয় এবং তাদের কাজের প্রতিটি পদক্ষেপে আইন মেনে চলতে হয়।

(গ) বিদেশি কোম্পানি বাংলাদেশে পরিচালনা করার উপায়:

বাংলাদেশে বিদেশি কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম ও বিধি-বিধান মেনে চলতে হয়। একটি বিদেশি কোম্পানি বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা করতে চাইলে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে:

১. নিবন্ধন:

বিদেশি কোম্পানির বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা করতে হলে প্রথমে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস (RJSC)-এ নিবন্ধন করতে হয়। নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য নিম্নলিখিত তথ্য ও নথি জমা দিতে হবে:

- কোম্পানির মূল নথি, যেমন মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন (MOA & AOA)।
- বোর্ডের রেজোলিউশন, যেখানে বাংলাদেশে ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
- কোম্পানির প্রত্যয়িত অনুলিপি এবং নিবন্ধনপত্র।
- অধিকারিক বা প্রতিনিধি নিয়োগ করে একটি ফরেন ব্রাঞ্চ অফিস বা প্রতিনিধি অফিস স্থাপনের নথি।

২. বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA)-এর অনুমতি:

বিদেশি কোম্পানি বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য **বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA)** থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। এটি কোম্পানির বিনিয়োগ, কার্যক্রম, এবং নীতিমালা নির্ধারণ করে। অনুমতি পেতে চাইলে কিছু নথিপত্র জমা দিতে হয়, যেমন:

- কোম্পানির নিবন্ধন সংক্রান্ত নথি।
- পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন।
- বিদেশি বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য।
- কোম্পানির ব্যবসায়িক পরিকল্পনা।

৩. ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা:

- বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিদেশি কোম্পানিকে একটি **ব্যাংক অ্যাকাউন্ট** খুলতে হবে। এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কোম্পানি লেনদেন পরিচালনা করবে এবং প্রয়োজনীয় ফান্ড ট্রান্সফার করবে।
- বিদেশি মুদ্রার লেনদেন বা স্থানান্তরের জন্য **বাংলাদেশ ব্যাংকের** অনুমতি প্রয়োজন হতে পারে।

৪. আয়কর নিবন্ধন:

- কোম্পানিকে **আয়কর বিভাগ** থেকে **ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (TIN)** নিতে হবে। এটি বাংলাদেশে পরিচালিত ব্যবসার জন্য আয়কর পরিশোধ করতে প্রয়োজন।
- এছাড়া, **ভ্যাট নিবন্ধন (VAT Registration)** করতেও হবে, যা পণ্য ও সেবার উপর ভ্যাট আরোপের জন্য দরকার।

৫. শেয়ারহোল্ডার এবং পরিচালকদের নিয়োগ:

বিদেশি কোম্পানি বাংলাদেশে শেয়ারহোল্ডার এবং পরিচালক নিয়োগ করতে পারে। এ জন্য কোম্পানির **মেমোরেন্ডাম** এবং **আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন**-এ নিয়মিত সংশোধনী বা অনুমোদন প্রয়োজন।

৬. অফিস স্থাপন:

বিদেশি কোম্পানির অফিস স্থাপন করতে হলে, তারা একটি **শাখা অফিস (Branch Office)** বা **প্রতিনিধি অফিস (Liaison Office)** স্থাপন করতে পারে। শাখা অফিসের মাধ্যমে কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালিত হয়, এবং এই অফিসটি মূল কোম্পানির সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৭. নিয়োগ এবং কর্মী সুবিধা:

বাংলাদেশে কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মী নিয়োগ করতে হবে। কর্মীদের নিয়োগ, বেতন এবং অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুসরণ করতে হবে।

৮. বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল:

বিদেশি কোম্পানিকে রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ-এ বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে, যেখানে কোম্পানির কার্যক্রম এবং আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করতে হবে।

৯. অন্য আইনি ও বিধিবদ্ধ অনুমোদন:

বিশেষ কিছু খাত যেমন ব্যাংকিং, বীমা, টেলিকমিউনিকেশন, এবং শক্তি খাতে ব্যবসা পরিচালনার জন্য আলাদা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা থেকে অনুমতি নিতে হয়।
উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC) ইত্যাদি।

উপসংহার:

বিদেশি কোম্পানি বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য নিবন্ধন, অনুমতি এবং অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করতে হয়। এর মাধ্যমে তারা স্থানীয় বাজারে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এবং বিনিয়োগ করতে পারে। তবে সমস্ত কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও নীতিমালা মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

*** (ক) কোম্পানি সচিবের সংজ্ঞা:

কোম্পানি সচিব হলো সেই ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির প্রশাসনিক কার্যক্রম ও আইনগত কার্যাবলির দায়িত্ব পালন করে। তিনি পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কোম্পানির সাথে শেয়ারহোল্ডার ও রেগুলেটরি সংস্থার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন।

(খ) কোম্পানির সচিবের কার্যাবলি:

1. পরিচালনা পর্ষদের সভার আয়োজন ও কার্যবিবরণী রক্ষণ।
2. শেয়ারহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ এবং তাদের অভিযোগ সমাধান করা।
3. আইনি দলিলপত্র সংরক্ষণ এবং কোম্পানির নিবন্ধন বিষয়ক কাজ পরিচালনা করা।
4. বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন ও বিবরণপত্র প্রস্তুত করা।
5. রেগুলেটরি সংস্থার কাছে কোম্পানির কার্যাবলি রিপোর্ট করা।

(গ) কোম্পানি সচিবের অধিকার ও ক্ষমতা:

1. কোম্পানির নীতি ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার অধিকার।
2. কোম্পানির আর্থিক ও আইনি বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা।
3. কোম্পানির নথিপত্র যাচাই ও প্রস্তুত করার ক্ষমতা।
4. কোম্পানির পরিচালকদের নির্দেশনা পালন করানো।

***ক) কীভাবে পরিচালকের পদ শূন্য হয়:

1. মৃত্যুর কারণে।
2. দেউলিয়াত্বের কারণে।
3. অনৈতিক বা অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য পদত্যাগ।
4. পরিচালনার মেয়াদ শেষ হলে পুনঃনির্বাচনে ব্যর্থ হলে।
5. যদি কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী পরিচালকের পদ অপসারণ করা হয়।

(খ) পরিচালকদের যোগ্যতা বা গুণাবলি:

1. কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত বয়সসীমা মেনে চলা।
2. সৎ ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া।
3. কোম্পানির উদ্দেশ্য ও আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা।
4. আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা থাকা।
5. শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যোগ্যতা থাকা।

(গ) পরিচালকদের ক্ষমতা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধসমূহ:

1. পরিচালনা পর্ষদের সম্মতি ব্যতীত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।
2. কোম্পানির সম্পত্তি বা তহবিল নিজস্ব কাজে ব্যবহার করতে পারেন না।
3. আইনের সীমার বাইরে কোনো কার্যকলাপ করতে পারেন না।
4. শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন ব্যতীত কোম্পানির মূলধন বৃদ্ধি করতে পারেন না।

***ক) লভ্যাংশ কী?

লভ্যাংশ হলো কোম্পানির মুনাফার একটি অংশ, যা শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বন্টন করা হয়। এটি শেয়ারহোল্ডারদের বিনিয়োগের উপর তাদের লাভের অংশ হিসেবে দেওয়া হয়।

(খ) লভ্যাংশের শ্রেণিবিভাগ:

লভ্যাংশ হলো কোম্পানির মোট মুনাফা থেকে শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করা একটি নির্দিষ্ট অংশ। এটি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিনিয়োগের উপর একটি আয় হিসেবে বিবেচিত হয়। লভ্যাংশ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এবং এর শ্রেণিবিভাগ করা হয় বিভিন্ন ভিত্তিতে। নিচে লভ্যাংশের প্রধান শ্রেণিবিভাগগুলো আলোচনা করা হলো:

১. নগদ লভ্যাংশ (Cash Dividend):

নগদ লভ্যাংশ হলো শেয়ারহোল্ডারদের নগদ অর্থের মাধ্যমে প্রদত্ত লভ্যাংশ। এটি সবচেয়ে সাধারণ ধরনের লভ্যাংশ। শেয়ারহোল্ডারদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি নগদ অর্থ জমা করা হয়।

২. স্টক লভ্যাংশ (Stock Dividend):

স্টক লভ্যাংশ হলো নগদের পরিবর্তে শেয়ারহোল্ডারদের নতুন শেয়ার দেওয়া। এটি কোম্পানির মালিকানার অংশ বাড়িয়ে দেয় কিন্তু শেয়ারহোল্ডারদের হাতে কোনো নগদ অর্থ দেয় না। সাধারণত কোম্পানির মুনাফা নগদ আকারে বিতরণ না করে পুনরায় বিনিয়োগ করার ইচ্ছে থাকলে এটি প্রদান করা হয়।

৩. সম্পত্তি লভ্যাংশ (Property Dividend):

কিছু কিছু ক্ষেত্রে, কোম্পানি নগদ বা শেয়ারের পরিবর্তে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে তাদের নির্দিষ্ট সম্পত্তির আকারে লভ্যাংশ বিতরণ করতে পারে। একে সম্পত্তি লভ্যাংশ বলা হয়। এটি তুলনামূলকভাবে কম প্রচলিত।

৪. বোনাস লভ্যাংশ (Bonus Dividend):

বোনাস লভ্যাংশ হলো শেয়ারহোল্ডারদের বিনামূল্যে অতিরিক্ত শেয়ার প্রদান করা। এটি স্টক লভ্যাংশের মতো, তবে এখানে শেয়ারের মূল্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়।

৫. অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ (Interim Dividend):

এটি হলো লভ্যাংশ যা বছরের মাঝামাঝি সময়ে শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, অর্থাৎ আর্থিক বছরের শেষ হওয়ার আগে। অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ সাধারণত ত্রৈমাসিক বা অর্ধ-বার্ষিক আয়ের উপর ভিত্তি করে বিতরণ করা হয়।

৬. চূড়ান্ত লভ্যাংশ (Final Dividend):

আর্থিক বছরের শেষে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ যদি মনে করে যে কোম্পানি পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন করেছে, তবে তারা শেয়ারহোল্ডারদের চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদান করতে পারে। এটি সাধারণত আর্থিক বছরের শেষ হিসাবের পর বিতরণ করা হয়।

৭. বিকল্প লভ্যাংশ (Optional Dividend):

কিছু কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের কাছে বিকল্প লভ্যাংশের সুযোগ দেয়, যেখানে তারা নগদ বা শেয়ার লভ্যাংশের মধ্যে বেছে নিতে পারেন। এটি শেয়ারহোল্ডারদের প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে সুবিধাজনক হতে পারে।

উপসংহার:

লভ্যাংশের বিভিন্ন ধরন রয়েছে, যা কোম্পানির অর্থনৈতিক অবস্থান এবং পরিচালনা নীতির উপর নির্ভর করে। শেয়ারহোল্ডাররা নগদ লভ্যাংশ, স্টক লভ্যাংশ, বা সম্পত্তি লভ্যাংশ পেতে পারেন এবং তাদের আয় এবং বিনিয়োগের উপর ভিত্তি করে তা বেছে নিতে পারেন।

(গ) কোম্পানি আইন অনুযায়ী লভ্যাংশ বন্টন সংক্রান্ত নিয়মাবলি:

বাংলাদেশে কোম্পানির লভ্যাংশ বন্টনের প্রক্রিয়া এবং নিয়মাবলি কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইনের আওতায় কোম্পানি পরিচালকদের নির্দিষ্ট নিয়মাবলি মেনে লভ্যাংশ বন্টন করতে হয়। নিচে কোম্পানি আইন অনুযায়ী লভ্যাংশ বন্টন সংক্রান্ত প্রধান নিয়মাবলি তুলে ধরা হলো:

১. লভ্যাংশ ঘোষণা:

- লভ্যাংশ ঘোষণার ক্ষমতা শুধুমাত্র কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের (Board of Directors) রয়েছে। পরিচালকেরা বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতি নিয়ে লভ্যাংশ ঘোষণা করেন।
- কোম্পানি যদি অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ (Interim Dividend) ঘোষণা করে, তাহলে পর্ষদ সভার (Board Meeting) মাধ্যমে তা করতে পারে।

২. শুধুমাত্র মুনাফা থেকে লভ্যাংশ বন্টন:

- কোম্পানি শুধুমাত্র চলতি বছরের অর্জিত মুনাফা অথবা আগের বছরের সঞ্চিত মুনাফা থেকে লভ্যাংশ বিতরণ করতে পারে।
- যদি কোনো কোম্পানি লোকসানে থাকে বা সঞ্চিত মুনাফা না থাকে, তাহলে তারা লভ্যাংশ ঘোষণা করতে পারবে না।

৩. আদায়যোগ্য নগদ লভ্যাংশ:

কোম্পানির নেট মুনাফা থেকে শুধুমাত্র আদায়যোগ্য অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে নগদ লভ্যাংশ হিসেবে বন্টন করা যেতে পারে। এর অর্থ হলো, পরিচালকদের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত কোনো অংশ লভ্যাংশ হিসেবে বন্টনের উপযোগী হতে হবে।

৪. চূড়ান্ত লভ্যাংশ বিতরণ:

- কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM)-এ চূড়ান্ত লভ্যাংশ (Final Dividend) ঘোষণা করা হয়। AGM-এ শেয়ারহোল্ডাররা পরিচালনা পর্ষদের প্রস্তাবিত লভ্যাংশের অনুমোদন দেন।
- পরিচালকেরা অনুমোদিত পরিমাণের কম লভ্যাংশ দিতে পারবেন না, তবে AGM-এ শেয়ারহোল্ডাররা লভ্যাংশের পরিমাণ বাড়াতে পারবেন না।

৫. অংশীদারদের জন্য প্রাপ্যতা:

লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য উপযুক্ত দিনে প্রাপ্য হতে হবে। যেসব শেয়ারহোল্ডার কোম্পানির রেকর্ড তারিখে (Record Date) শেয়ারধারী ছিলেন, তারাই সেই ঘোষিত লভ্যাংশ পাবেন।

৬. লভ্যাংশ প্রদান সময়সীমা:

ঘোষিত লভ্যাংশ ৩০ দিনের মধ্যে শেয়ারহোল্ডারদের প্রদান করতে হবে। যদি কোম্পানি এই সময়ের মধ্যে লভ্যাংশ প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, তবে আইন অনুযায়ী তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

৭. ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট:

নগদ লভ্যাংশ প্রদান করতে হলে কোম্পানি ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট বা ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশ প্রদান করবে।

৮. ডিফল্ট বা অঘোষিত লভ্যাংশের নিয়ম:

যদি কোনো কোম্পানি মুনাফা অর্জন করার পরও লভ্যাংশ ঘোষণা না করে, তাহলে শেয়ারহোল্ডারদের আইনগত অধিকার রয়েছে। তারা এটি নিয়ে **কোম্পানি ট্রাইব্যুনাল** বা আদালতে আবেদন করতে পারেন।

৯. প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার:

প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডাররা সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের চেয়ে লভ্যাংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পান। তাদের লভ্যাংশ প্রদান সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা লভ্যাংশ পাবেন না।

উপসংহার:

বাংলাদেশের কোম্পানি আইন অনুযায়ী লভ্যাংশ বণ্টনের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মাবলি অনুসরণ করতে হয়, যা কোম্পানি পরিচালকদের বাধ্যতামূলক। আইন অনুযায়ী লভ্যাংশ ঘোষণার সময় শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এসব নিয়মাবলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

*** (ক) পরিচালক পর্ষদ বলতে কী বুঝায়?

পরিচালক পর্ষদ হলো কোম্পানির পরিচালকদের একটি দল, যারা কোম্পানির নীতি নির্ধারণ, আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সাধারণ পরিচালনা দেখাশোনা করে। তারা কোম্পানির প্রধান প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

(খ) পরিচালকের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা:

কোম্পানির পরিচালকদের নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের কিছু নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকা জরুরি। একই সঙ্গে, কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ না হলে কেউ পরিচালকের পদে থাকতে পারেন না। নিচে পরিচালকের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

পরিচালকের যোগ্যতা:

কোনো ব্যক্তি পরিচালকের পদে আসীন হওয়ার জন্য কিছু নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকা দরকার। এই যোগ্যতাগুলো হলো:

১. বয়স:

পরিচালকের পদে থাকতে হলে সাধারণত ব্যক্তির **১৮ বছর বা তার বেশি বয়স** হতে হবে।

২. ক্ষমতা:

তিনি মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে, অর্থাৎ তাকে অবশ্যই **সম্পূর্ণভাবে সক্ষম** হতে হবে যাতে তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং কোম্পানির স্বার্থে কাজ করতে পারেন।

৩. অর্থনৈতিক দক্ষতা:

পরিচালকের পদে থাকা ব্যক্তিকে অবশ্যই **আর্থিকভাবে সুসজ্জত** হতে হবে, অর্থাৎ কোনো দেউলিয়াত্ব বা তহবিলের ঘাটতি থাকা যাবে না।

৪. আইনি বাধ্যবাধকতা পূরণ:

একজন পরিচালককে অবশ্যই কোম্পানি আইনের অধীনে থাকা সব নিয়ম মেনে চলতে হবে। কোম্পানির স্বার্থে কাজ করতে হবে এবং কোনো অনৈতিক বা বেআইনি কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

৫. শেয়ারহোল্ডার হওয়ার প্রয়োজন:

অনেক কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিচালকদের শেয়ারহোল্ডার হওয়া আবশ্যিক। তবে কিছু ক্ষেত্রে, একজন পরিচালককে শেয়ারহোল্ডার হওয়ার প্রয়োজন নাও থাকতে পারে।

পরিচালকের অযোগ্যতা:

কিছু শর্ত বা অবস্থার কারণে একজন ব্যক্তি পরিচালকের পদে থাকতে অযোগ্য বিবেচিত হন। সেগুলো হলো:

১. দেউলিয়াত্ব ঘোষণা:

যদি কোনো ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষণা হন, তবে তিনি পরিচালকের পদে আসীন হতে পারবেন না। কারণ এটি আর্থিক অব্যবস্থাপনার নির্দেশক।

২. অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত থাকা:

যদি কোনো ব্যক্তি বেআইনি বা অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত থাকেন এবং তার বিরুদ্ধে মামলা বা অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তবে তিনি পরিচালকের পদে অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

৩. আইনের লঙ্ঘন:

যদি কোনো ব্যক্তি কোম্পানির আইন ভঙ্গ করেন বা অন্য কোনো নিয়ম-নীতি মানেন না, তবে তাকে পরিচালকের পদ থেকে অপসারণ করা হতে পারে।

৪. মানসিক অসুস্থতা:

যদি কোনো ব্যক্তি মানসিকভাবে অসুস্থ হন এবং তার বিচার-বুদ্ধি ঠিকমতো কাজ না করে, তবে তাকে পরিচালকের পদ থেকে অযোগ্য ঘোষণা করা হতে পারে।

৫. দুর্নীতির অভিযোগ:

কোনো ব্যক্তি যদি দুর্নীতি বা আর্থিক অনিয়ম করে থাকেন, তবে তিনি পরিচালকের পদে থাকতে পারবেন না।

উপসংহার:

কোম্পানির পরিচালক হিসেবে সঠিক যোগ্যতা থাকা যেমন জরুরি, তেমনি অযোগ্যতার শর্তও রয়েছে। যোগ্যতা ও অযোগ্যতা মেনে একজন পরিচালককে পরিচালকের পদে থাকার বা অপসারণের অধিকার প্রদান করা হয়, যা কোম্পানির কার্যক্রম সুষ্ঠু ও ন্যায্যসঙ্গতভাবে পরিচালিত করতে সহায়ক।